স্মৃতিতে জীবনানন্দ

স্মৃতিতে জীবনানন্দ

সম্পাদনা ও সংকলন
সজল আহমেদ

কবি

স্মৃতিতে জীবনানন্দ
সম্পাদনা ও সংকলন : সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রিন্টার্স
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৪৫০

SMRITITE JIBANANANDA Edited By Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
First Edition: February 2018
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 450 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-92879-1-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর-কিছু লেখেন না; তার চেয়ে তিনি স্বভাব-লাজুক ও মফস্বলবাসী; এইসব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে সরে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হতেই পারে না। কেননা এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।' (বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৯)

বাংলাসাহিত্যের প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ। শুদ্ধতম এই কবির ব্যক্তি-জীবন ছিল রহস্যের জালে আবৃত। কেমন ছিলেন তিনি? তাঁর কবিতা পাঠ করতে করতে এই আকাঙ্ক্ষা সব পাঠকের মধ্যেই জেগে ওঠে। 'স্মৃতিতে জীবনানন্দ' সেই রহস্য উন্মোচনের খোঁজে সংকলিত হলো। একত্রিত হলো এমন কিছু মানুষের স্মৃতিচারণ, যাঁরা ছিলেন কবির ঘনিষ্টতম। এছাড়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও সংকলিত হয়েছে কবি ও কবিতার সম্পর্কে। যা জীবনানন্দপ্রেমীদের আনন্দ দেবে।

বিভিন্ন সংকলন ও পত্রিকা থেকে লেখাগুলো সংকলিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লেখক ও সম্পাদকের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

কায়সুল হকের লেখা 'জীবনানন্দ' প্রবন্ধটি তার সুযোগ্য পুত্র রবিউল হক সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আর যাদের জন্য এই সংকলন তাদের ভালো লাগলেই আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত সম্পাদক

সূচি

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে : বুদ্ধদেব বসু ৯
অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৬
মানুষ জীবনানন্দ : লাবণ্য দাশ ২৯
স্মৃতিচিত্র : নলিনী দাশ ৫৯
বাল্যস্মৃতি : অশোকানন্দ দাশ ৬২
আমার জ্যাঠামশাই : অমিতানন্দ দাশ ৮১
কাছের জীবনানন্দ : সুচরিতা দাশ ৮৩
জীবনানন্দ দাশ : আমার বাবা : মঞ্জুশ্রী দাশ ৯৬
জীবনানন্দ দাশ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১০০
তাঁকে সহকর্মী হিসাবে দেখেছি : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
মিথুন-সমীক্ষণ : ছায়ানট : প্রেমেন্দ্র মিত্র ১১০
তিন দিনের পরিচয়েই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম : অরুণ মিত্র ১১২
জীবনানন্দ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১১৫
জীবনানন্দ স্মৃতি : সুবোধ রায় ১১৭
জীবনানন্দ প্রসঙ্গে : শামসুদ্দীন আবুল কালাম ১৩২
জীবনানন্দের সঙ্গে : গোপালচন্দ্র রায় ১৩৯
জীবনানন্দ প্রসঙ্গ : জীবন-নদীর তীরে : অজিত কুমার ঘোষ ১৫৪
স্মৃতিচিত্র : শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ১৫৬
স্মৃতিচিত্র : মুরারি সাহা ১৫৮
স্মৃতিচিত্র : অমল দত্ত ১৬০
আমাদের কবি : অশোক মিত্র ১৬৪
জীবনানন্দ সম্পর্কে : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬৮
অসীমের সৈকতে : শামসুর রাহমান ১৭০
বেলা অবেলার পটভূমি : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৭৪
নির্জনতম কবি : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৮০
জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার : শঙ্খ ঘোষ ১৮৬
জীবনানন্দীয় চিত্রকল্প : বাগীশ্বরী দ্যোতনা : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০
'আমি চলে যাবো' : ইন্দ্র মিত্র ২০৩

ধূসর পাণ্ডুলিপি : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২০৭
জীবনানন্দের ঘর : পূর্ণেন্দু পত্রী ২১২
জীবনানন্দ দাশ ও তার উপন্যাস : বিমল কর ২২৪
স্মৃতিচিত্র : আলোক সরকার ২২৭
জীবনানন্দ : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২২৯
ধানসিড়ি নদীর সন্ধানে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৩০
আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৪০
'ওঁরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকব না...' : ভূমেন্দ্র গুহ ২৫০
জীবনানন্দ দাশ : নরেশ গুহ ২৬৯
অসাধারণ অথচ স্বাভাবিক এক ভাষাশিল্পী : ক্লিনটন বুথ সিলি ২৭২
জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা : আবদুল মান্নান সৈয়দ ২৭৬
জীবনানন্দের 'ঘাস' : 'ঘাসের শরীর ছানি' : ক্ষেত্র গুপ্ত ২৮৮
জীবনানন্দের কাব্যভাষা : পবিত্র সরকার ২৯৪
মেরু সমুদ্রের মতো : জয় গোস্বামী ৩১৫
জীবনানন্দ দাশ : কায়সুল হক ৩২৪

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

বুদ্ধদেব বসু

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হলো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেল, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক বলেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু করে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দুজন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে সম্পাদক দুজনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হতো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিল। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম বলে ভুল করছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিল যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিঃশ্বাস পতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে

অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোনো কোনো লেখা বেরিয়েছিল সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিল '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলো এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্টিয়ে প্রায় অবাক হয়ে দেখছি—প্রথম দেখা দিয়েছিল 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা' 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে' 'পরিচয়ে', 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতায়, আর কোনো কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তার উপর যখন বই ছাপা হলো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম; তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ বলে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়নি।

'প্রগতি'তে শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিল আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিল, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। দেশের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড় ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে-পাস-করা প্রফেসর, আর কেউ বা ফরাসি জার্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত করে একটিমাত্র কবিতার পংক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, সরে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে কদিন 'প্রগতি' চলেছিল, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধু সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না করে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান খাওয়া লাল লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হতো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হতো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে

ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক; বলে মনে হয় তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হলো, তা না হলে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিল। এ কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে কলকাতার কোনো এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হতে পারে না এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হয়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড় একটা অংশ হলো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় বলে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যেসব আলোচনা বেরিয়েছিল তার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলোর লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও, অংশগুলো অন্য কারণে ব্যবহার্য হতে পারে : প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী রকম ভাবে সাড়া তুলেছিল; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ পর্যন্ত মোটেই Popularity অর্জন করতে

পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ,—অচিন্ত্যবাবুর মতো তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ; ... তাঁর কবিতা একটু ধীরে সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে- আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তাঁকে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়। .... তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে 'অদ্ভুত' স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না। ... [তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করেনি যথা, 'ফেঁড়ে', 'নটকান', 'শেমিজ', 'থুতনি' ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে কথা আগেই বলেছি; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরি করে' নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।

একথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।... জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান;—সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।... [সেইজনেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় 'renascence of wonder' ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হলেও 'বলাকা'র' ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে;—'বলাকা'র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মতো তোড় এর নেই;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতঃস্বিনী—থেমে থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে ঠেকে উদাস, অলস গতিতে বয়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। * * *

জীবনানন্দবাবুর ... বহু ... কবিতায় পরমবিস্ময়কর কথাচিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued। ... দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কটি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান

ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাক প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে।

এখানে যেন কথা শেষ হয়েও শেষ হয়নি;—কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ন সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার... ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে' থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মতো গুঞ্জন করে' ভেসে যায়।

('প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। *** আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ । কে তিনি?

অনিল । জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ । জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনিনি তো!

অনিল । জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি।

তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে—আকাশে।'.....আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটিমাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হয়ে উঠেছে; শব্দের মূল্যবোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালি কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ । (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল । এই কবি... উভচর ভাষা অবলম্বন করে' আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সবচেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে? তুমি যদি অনুমতি করো

প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ । শুনি ?

অনিল । (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা
রুধিরে পিপাসা
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passage টির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তাছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে—একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে থেমে পড়তে হয়—তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি।' বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ ।। তোমার, মতন কেউ । নাই আর ।।'

সুরেশ । তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল । ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি। ... শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ । দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিল না, কিন্তু ছেঁড়া!

অনিল । ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ । ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য ধরা পড়বে। দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাংলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'রা বিধি-বিধান, তার spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা। ... অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত convention গুলো এখনো